ভীলাঙ্গনা নদীর সঙ্গমে টিহরি গাড়োয়ালের প্রাচীন রাজধানী। ১৯৭৮ সালে গোটা জনপদ এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে বাঁধ তৈরির কাজ আরম্ভ হল। গঙ্গা বাঁচাতে এগিয়ে এলেন সুন্দরলাল বহুগুণা। ক্ষমতার কাছে পরাস্ত হতে হল সবাইকে। ২০০৬ সালে টিহরি বাঁধের কাজ শেষ হল। টিহরি থেকে ধারাসু পর্যন্ত এখানে শান্ত দীঘি হয়ে রয়েছে গঙ্গা। জলে ডুবে হারিয়ে গিয়েছে এখানকার মানুষের সংস্কৃতি। নদীর গান গিয়েছে স্তব্ধ হয়ে। পলি জমে নদী এখানে মৃত্যুমুখী।

হৃষীকেশ থেকে ৭১ কিলোমিটার দূরে গঙ্গা আর অলকানন্দার সঙ্গমে দেবপ্রয়াগ। দেবপ্রয়াগ থেকে পাহাড়ি পথ ধরে গঙ্গা এসেছে হৃষীকেশে। বরাহ পুরাণের আখ্যান অনুসারে যুগ–যুগান্তরের তপস্যাভূমি এই হৃষীকেশ। শহর থেকে ৫কিলোমিটার দূরে গঙ্গার উপর ঝুলন্ত সেতু লছমনঝুলা। সামনে রয়েছে ভারতের এক মাত্র লক্ষ্মণের মন্দির। আশ্চর্য ভাবে এক বিকেল বেলা এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হল চঞ্চলের। তাঁর মুখ থেকে শোনা গেল এক বিচিত্র কাহিনি। তাঁর যুক্তি আর্যরা কীভাবে বেদ রচনা করবে, ওরা তো বর্বর জাতি। এ দেশের মানুষই বেদ রচনা করেছে। সঙ্গে আরও কত কী তিনি বললেন।

এরপর হরিদ্বার, গড় মুক্তেশ্বর, কনৌজ, বিঠুর পেরিয়ে কানপুরে আসা হল। উত্তরপ্রদেশের বৃহত্তম শহর কানপুরের অতীত নাম ছিল ভগবান কৃষ্ণের নাম অনুসারে কানহাপুর। পরে কানহাপুর শহরের নাম হয় কানপুর। অবশ্য মহাভারতের এক কাহিনি অনুসারে দুর্যোধন তাঁর মিত্র কর্ণকে এই নগরী দান করেন। পরে ওই জায়গার নাম হয় কর্ণপুর। তাঁর থেকে কানপুর। হিমালয় থেকে গঙ্গা সমভূমিতে অবতরণ করার পর কানপুরে এসে ভয়াবহ শিল্প দূষণের কবলে পরেছে। কলুষনাশিনী গঙ্গা আজ কলুষদায়িনী গঙ্গায় পরিণত হয়েছে।

আজকের এলাহাবাদ অতীতে নাম ছিল প্রয়াগ।এখানে গঙ্গা আর যমুনা মিশেছে সরস্বতী নদীর অদৃশ্য ধারার সঙ্গে।পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস ৩০২ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি কনৌজ ও প্রয়াগ পরিদর্শন করে পাটলিপুত্রে যান। সম্রাট আকবর প্রয়াগে গঙ্গার তীরে দুর্গ নির্মাণ করেন। ১৫৭৫ সালে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এসেছিলেন প্রয়াগে। শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন দু'বার। কুম্ভের স্নানের দিন চঞ্চল ছিলেন এলাহাবাদে। অতিথি নিবাস থেকে বেরিয়ে দেখেন থরে থরে মানুষ। এক অল্পবয়সি সাধুর সঙ্গে দেখা হল চঞ্চলের। কুম্ভের অর্থ জানতে চাইলে সাধু জানান, কুম্ভ মানে পাত্র। যে পাত্রে অমৃত ধারণ করা হয়। আর মেলার অর্থ মিলন। আবার আর একটি অর্থ হল, যা অকল্যাণ দূর করে বিশ্বের মঙ্গল সাধন করে। বেলা বাড়ছিল। মানুষের ভিড় আছড়ে পড়ছে গঙ্গার কূলে। দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই। জনস্রোতেই এগিয়ে চললেন চঞ্চল।

এরপর বারাণসী। অন্ধকার থাকতেই রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বের হয়েছেন চঞ্চল। গঙ্গার ঘাট ধরে হাঁটতে হাঁটতে যখন তিনি হরিশ্চন্দ্র ঘাটে এসে পৌঁছোলেন তখন দিনের প্রথম আলো ফুটেছে। কয়েকটা ঘাট বাদ দিয়ে প্রায় সব ঘাটই জনশূন্য। বারাণসীর ঘাটের মতো এমন বৈচিত্রময় রূপ আর কোথাও দেখা যায় না। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে বারাণসীর নানান নাম–আনন্দবন, রুদ্রাবাস প্রভৃতি। জাতকেও এই নগরের নানান নাম পাওয়া যায়— সুরন্ধনা, সুদর্শনা, পুষ্পবতী, মালিনী ইত্যাদি। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে কাশী হল বিশ্বের প্রাচীনতম এক জনপদ। বলা হয় মনু রাজবংশের সপ্তম রাজা কাশ ছিলেন কাশীর প্রথম রাজা।

এখানে দক্ষিণমুখী বরুণা আর পশ্চিম বাহিনী অসি নদী এসে গঙ্গায় মিশেছে। অসি আর বরুণা নদীর সঙ্গমের মধ্যে অবস্থিত বলে কাশীর আর এক নাম বারাণসী। কাশীর সমস্ত সত্তা লুকিয়ে আছে গঙ্গার ঘাটে। হাঁটতে হাঁটতে চঞ্চল দাঁড়ালেন তুলসী ঘাটে। গঙ্গার দক্ষিণে রয়েছে অসিঘাট। এর উল্লেখ পাওয়া যায় মৎস্যপুরাণ ও অগ্নিপুরাণে। এ ছাড়াও অন্যান্য এন্য কয়েকটি ঘাট হল, কেদার ঘাট, রাজা ঘাট, প্রহ্লাদ ঘাট, ত্রিলোচন ঘাট, রাম ঘাট, মনিকর্ণিকা ঘাট, ললিতা ঘাট, মীরা ঘাট প্রভৃতি। কাশীর শ্রেষ্ঠ ঘাট দশাশ্বমেধ ঘাট। পুরাণে বলে, অতীত কালে শিবের আদেশে ব্রহ্মা এখানে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। সেই জন্য এই স্থানের নাম হয় দশাশ্বমেধ ঘাট।

এর পর গঙ্গানদী বিহারে পাটনা শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ঝাড়খণ্ডের রাজমহল পাহাড়কে অতিক্রম করে ফারাক্কার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। নদীর বুকে ফারাক্কাতে ব্যারাজ তৈরি হয়েছে। যে বাঁধ গঙ্গার গলা টিপে ধরেছে। এখান থেকে গঙ্গা দু'ভাগে ভাগ হয়েছে। একটি অংশ ভাগীরথী,অন্যটি পদ্মা।

ভাগীরথীর তীরে রয়েছে হিন্দু তীর্থস্থান নবদ্বীপ। বাংলা ১৪৮৬–র দোল পূর্ণিমার দিন নবদ্বীপে জন্ম হয় শ্রীচৈতন্যদেবের। সরকারি হিসাবে বলা হয় ১৮৬টি মন্দির রয়েছে নবদ্বীপে। আবার প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হয় এই নবদ্বীপকেই।

এর পর আসে কলকাতা। হরিদ্বার বা কাশীর মতো ভাগীরথী তীরের কলকাতার বিশেষ প্রাচীন কোনও ইতিহাস নেই। তবে কলকাতার গঙ্গার তীরেও গড়ে উঠেছে অনেক ঘাট। এগুলি বেশির ভাগই ১৮ শতকে তৈরি। কাশীপুরের শ্মশান ঘাট তৈরি হয়েছিল ১৮৭৪–৭৫ সালে। এই ঘাট তৈরি করেছিলেন দুর্গাপ্রসাদ প্রামাণিক। এখানে বহু বিখ্যাত মানুষকে দাহ করা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, শিশির ভাদুড়ি প্রমুখ। এর পর রতনবাবুর ঘাট। জমিদার রামরতন দত্ত রায় এই ঘাট সাধারণ মানুষের জন্য নির্মাণ করে দেন। এই ঘাট পেরিয়ে গঙ্গার ওপারে গড়ে ওঠে বিবেকানন্দের স্বপ্নের মন্দির বেলুড় মঠ।

ইংরেজ আমলে কাশীপুর অস্ত্র কারখানা থেকে গঙ্গার যে ঘাট দিয়ে অস্ত্র নিয়ে যাওয়া হত তাঁর নাম ছিল গান ফ্রাউন্ড্রি ঘাট বা বারুদ গাদার ঘাট। সরকারি অর্থে তৈরি করা এই ঘাটের এখন আর কোনও অস্তিত্ব নেই। জেমস প্রিন্সেপ ১৮১৯ সালে ট্যাঁকশালের চাকরি নিয়ে ভারতে আসেন। এই মানুষটির, লিপি, মুদ্রা, পুরাতত্ব বিষয়ে ছিল গভীর জ্ঞান। তিনি অশোকের শিলালিপি পাঠোদ্ধার করেন। তার স্মৃতিতেই তৈরি প্রিন্সেপ ঘাট। এ ছাড়াও রয়েছে বাগবাজার ঘাট, অন্নপূর্ণা ঘাট, নিমতলা ঘাট, জগন্নাথ ঘাট, বাবু ঘাট, আউট্রাম ঘাট, প্রভৃতি।

গোমুখে গঙ্গার জন্ম। তারপর দীর্ঘ পথ পেরিয়ে গঙ্গা যেখানে সগরে মিশেছে সেই গঙ্গা সাগর সঙ্গমে সাগরদ্বীপ। বলা হয়, এখানেই ছিল কপিল মুনির আশ্রম। ছেলেবেলায় ঠাকুমার কাছে চঞ্চল শুনেছিলেন, তাঁর ঠাকুমা বাবুঘাট থেকে নৌকা করে গঙ্গাসাগরে গিয়েছিলেন। যেতে লেগেছিল দেড় দিন। অল্প দূরেই মেলা শুরু হয়েছে। শত শত মানুষ সে পথে চলেছে।

পায়ের নীচে শুধু বালি আর বালি। দু'ধারে সার সার হোগলার ঘর। মকর স্নানে সকলে এসেছে। তীর্থযাত্রী থেকে ভিখারি। সামনেই কপিলমুনির মন্দির। টিনের চাল। চারদিকে বাঁশ দিয়ে ঘেরা। পুলিশ আর স্বেচ্ছাসেবকরা দাঁড়িয়ে। বাঁশের ওপারে মানুষের ভিড়। সবাই একটি বারের জন্য দর্শন করতে চাইছে মহর্ষি কপিলের মূর্তিকে। যাঁর অভিশাপ ভারতবর্ষের কাছে আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল।

এক জায়গায় সার দেওয়া ঘর। কয়েক হাত লম্বা আর কয়েক হাত চওড়া। এক এক ঘরে এক এক জন সাধু। ভস্ম মাখা বেশির ভাগই দিগম্বর। কয়েক জনের মাথায় জটা আছে। সাধুরা আশীর্বাদ দিচ্ছে। এক সাধু মাটিতে মাথা পুঁতে শরীরটা বের করে রেখেছেন। সামনে কাপড় রাখা, লোকেরা পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে। বেলা গড়ায়। সাগরের স্রোতের মতো মানুষের ঢল আসছে। কত পথ পেরিয়ে। কত কষ্ট করে। শুধু একটাই বিশ্বাস। সগর রাজার সন্তানের মতো তারাও যেন পাপ মুক্ত হতে পারে।

গঙ্গার উপর চঞ্চলের বই বেরিয়েছে ৬টি। এর মধ্যে ইংরেজি ও হিন্দি ভাষার বই রয়েছে। এত কিছুর পরেও প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে চঞ্চলের । মাসে মেরে কেটে ছ'হাজার টাকা আয়। তাতে কী । আগ্রহ তাঁর আকাশচুম্বী। কোনও বাধাই তাঁর চলার পথে প্রতিবন্ধকতা আনতে পারবে না।

এটা তাঁর বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসেই ভর করে পুরো পৃথিবীকেই তিনি জানাতে চান গঙ্গার কথা। তাই তাঁর নিয়ত ব্যস্ততা। অনেক কাজ তাঁর বাকি। আরও লিখতে হবে তাঁকে, গঙ্গাকে নিয়ে।

karmakarsuprotim@gmail.com

প্রচ্ছদের ছবি ঃ অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

হরিদ্বার বা কাশীর মতো ভাগীরথী তীরের কলকাতার বিশেষ প্রাচীন কোনও ইতিহাস নেই। তবে কলকাতার গঙ্গার তীরেও গড়ে উঠেছে অনেক ঘাট। এগুলি বেশির ভাগই ১৮ শতকে তৈরি। কাশীপুরের শ্মশান ঘাট তৈরি হয়েছিল ১৮৭৪–৭৫ সালে। এই ঘাট তৈরি করেছিলেন দুর্গাপ্রসাদ প্রামাণিক। এখানে বহু বিখ্যাত মানুষকে দাহ করা হয়